তাহরিকে
জামায়াতে ইসলামী

প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনের অনুসন্ধানী পর্যালোচনা

মূল :
ডা. ইসরার আহমাদ

অনুবাদ :
সাদিক ফারহান

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী

প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনের অনুসন্ধানী পর্যালোচনা

মূল : ডা. ইসরার আহমাদ
অনুবাদ : সাদিক ফারহান

প্রকাশনায়
গাইডলাইন পাবলিকেশন
৮নং দোকান, মাদ্রাসা মার্কেট নীচতলা,
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৬
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রচ্ছদ : ওমর ইবনে সাদিক
অঙ্গসজ্জা : হ্যাভেন গ্রাফ

খিলাফাহ বুকশপ
গুলজার টাওয়ারের ২য় তলায়, ব্লক-সি,
দোকান নং ১১, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
০১৭৬০০৬২০০৮

অনলাইন পরিবেশক
খিলাফাহ বুকশপ
https://khilafahshop.com

মূল্য : ৫০০৳

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	০৫
কৈফিয়ত	০৯
প্রাককথন	১৫
সূচনা-বক্তব্য	৩৩
নিজের সম্পর্কে কিছু কথা	৩৭
সরল স্বীকারোক্তি	৪৮
তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী প্রথম পর্ব ও মৌলিক চিন্তাদর্শন	৪৯
দ্বিতীয় পর্ব ও তার বৈশিষ্ট্য	১০৫
দ্বিতীয় পর্ব জামায়াতে ইসলামীর রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য	১০৮
সম্ভাব্য কারণসমূহের বিশ্লেষণ	১৯৮
তিনটি প্রস্তাবনা	২১৯

অনুবাদকের কথা

ডা. ইসরার আহমাদের *'তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী এক তাহকিকি মুতালাআ'* গ্রন্থটি মূলত একটি চিন্তনভিত্তিক দলিল, যেখানে বিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন *জামায়াতে ইসলামী*-র উদ্ভব, পথচলা ও আদর্শগত অবস্থান নিয়ে তিনি গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থে সংগঠনটির নিছক ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি; এখানে উঠে এসেছে ইকামাতে দ্বীনকে উদ্দেশ্য করে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনের আত্মমূল্যায়ন, আদর্শের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যায়, এটি গতানুগতিক কোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে সূচিত হয়নি, এটি ছিল মুসলিম সমাজের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পুনর্জাগরণ ও একটি বিশ্বাসনির্ভর সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য ছিল সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের শতভাগ বাস্তবায়ন। কিন্তু ইতিহাসের গতিধারায় এ আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠল, কীভাবে তার আদর্শ বিকশিত হলো, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গতিপথে কী কী পরিবর্তন ঘটল—এ বই সেই অনুসন্ধানেরই সুগভীর দলিল।

বইয়ের শুরুতে লেখক জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন ব্রিটিশ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীতে ইসলামী চিন্তার নতুন জাগরণ হিসেবে। মাওলানা মওদুদীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা ও তাঁর নেতৃত্বের শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে লেখক যে নিপুণ অনুসন্ধান করেছেন, তা কেবল প্রশংসা বা সমালোচনা বলে অভিহিত করা যায় না; বরং একটি আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বতালাশ ও বৌদ্ধিক পরীক্ষণ বলে অনুমিত হয়।

ডা. ইসরার দেখিয়েছেন, কীভাবে জামায়াতে ইসলামী প্রথমদিকে একটি মুসলিম ভাবাদর্শিক বিপ্লবী চিন্তার আন্দোলন হিসেবে সূচনা করলেও পরবর্তী সময়ে সংগঠন, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধীরে ধীরে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এ আন্দোলনের ভিত কি

যথেষ্ট কুরআনিক ও নববী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল, নাকি সময়ের গতিপ্রবাহে রাজনৈতিক তৎপরতার চাপেই তার মূল দর্শন ক্ষয় হয়ে গেছে?

নিঃসন্দেহে বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুহতারাম লেখকের গবেষণাধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি দলিল, উদ্ধৃতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তার বক্তব্য সাজিয়েছেন; আবেগ নয়, যুক্তি ও আত্মসমালোচনা তাঁর লেখার কেন্দ্রবিন্দু। ফলে এ বই পাঠকের সামনে কেবল একটি সংগঠনের ইতিহাস নয়, বরং 'ইসলামী আন্দোলন' ধারণা প্রসঙ্গে নতুন করে ভাবার সুযোগ দাঁড় করায়।

ভাষা ও বাগভঙ্গির দিক থেকে এটি একদিকে শুদ্ধ ও একাডেমিক, অন্যদিকে হৃদয়স্পর্শী ও অন্তর্মুখী। আলোচনার সূত্রে লেখক যখন নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন—জামায়াতে ইসলামী থেকে তাঁর বিচ্ছেদ, কিংবা নবোদ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা—তখন পাঠক বুঝতে পারেন, এটি শুধু ইতিহাসের সরল বয়ান নয়; এটি একজন চিন্তাশীল বোদ্ধা মুসলিমের আত্মিক ও আদর্শিক অভিযাত্রা।

বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে বইটি আজ নতুন প্রজন্মের সেসব সম্ভাবনাময় সদস্যের চিন্তায় প্রবেশ করছে, যারা ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ধারা ও তার পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া বুঝতে চায়। এটি এমনই উত্তীর্ণ রচনা, যা একদিকে 'তাহরিক'-এর সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করতে শেখায়, অন্যদিকে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে প্রেরণা জোগায়।

এখানে আমাদের নিজস্ব কোনো সংযোজন বা বিয়োজন নেই, এ বইয়ের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদই ডা. ইসরার আহমাদের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। আমরা কেবল তার সরল উপস্থাপনের ভার নিয়েছি। ডা. সাহেব কেবলই একজন মুসলিম চিন্তাবিদ নন, বরং জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের একজন রোকন হিসেবে তিনি তার অন্তরঙ্গ অংশীদার ছিলেন। সংগঠনের ভেতরকার জীবন, আদর্শের টানাপোড়েন, নেতৃত্বের উত্থান-পতন, সংকট ও সম্ভাবনা—সবই তিনি খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন। দ্বীন কায়েমের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এই আন্দোলনকে ভালোবেসেছেন, তার সাফল্যে আনন্দিত হয়েছেন এবং এর বিচ্যুতিতে বেদনা অনুভব করেছেন।

এই বইয়ে ডা. ইসরার আহমাদ নিজের দীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিজ্ঞতার আলোকে একদম গোছানো, গবেষণামূলক ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় জামায়াতের পথপরিক্রমা, আদর্শের পরিবর্তন ও নেতৃত্বের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থ কেবলই বাহ্যিক সমালোচনার মলাট নয়; বরং একজন ভেতরের মানুষ ও দীর্ঘকালীন সহযোদ্ধার অকপট আত্মকথন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই কথাগুলো তিনি নিঃশব্দে কাগজে লিপিবদ্ধ করে যাননি। বরং উন্মুক্ত মজলিসে, জামায়াতের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই তিনি তার মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 'ইজতেমায়ে আম্মা'-র মতো কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জনসমাবেশে তিনি তিনটি বৃহৎ প্রস্তাবনা আকারে এসব আপত্তি ও সমাধানের পদ্ধতি পেশ করেছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল জামায়াতকে পুনরায় তার মূল উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে আনা ও আদর্শিক শুদ্ধতার পথে স্থির করা। তাই এসব বক্তব্যকে নিছক ব্যক্তিগত মতামত বলে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই; এগুলো একটি আন্দোলনের ভেতর থেকে উচ্চারিত সজাগ ও নির্মোহ আত্মসমালোচনার নিরূপম ভাষ্য।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামী যেমন একটি শক্তিশালী অধ্যায়, তেমনি ডা. ইসরার আহমাদকে ধরা যায় সেই ধারার অন্যতম গভীর চিন্তক ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষক। এ গ্রন্থে তিনি একদিকে মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন, আবার অন্যদিকে আন্তরিক সমালোচনার দৃষ্টিতেও বিচার করেছেন।

যদিও এই রচনা পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে কেন্দ্র করে রচিত, তবু এর বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবনা শুধু পাকিস্তানের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস, নীতিমালা ও অভিজ্ঞতা প্রায় অভিন্ন। তাই পর্যালোচনামূলক এ গ্রন্থ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ গোটা ইসলামী আন্দোলনের জন্যই একটি দর্পণস্বরূপ, যার সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে নিজেদের উদ্দেশ্য, পথ ও বর্তমান অবস্থান যাচাই করতে পারে।

ডা. ইসরার আহমাদ যেন বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদের এ প্রশ্ন করতে আহ্বান জানিয়েছেন যে, আমরা কেন এই পথে এসেছি, আমাদের লক্ষ্য কী ছিল, আর আজ আমরা ঠিক কোন গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে।

এ বই তাই কেবলই ইতিহাস নয়; এটি উপমহাদেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলনের আত্মজিজ্ঞাসা, একজন চিন্তাশীল মুসলিমের হৃদয়ের আর্তনাদ এবং ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রতি সতর্ক আহ্বান।

পরিশেষে বলা যায়, 'তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী' শুধু কোনো আন্দোলনের নিরস পর্যালোচনা নয়, বরং একটি যুগের ভাব-সংশোধনের দলিল, যা ডা. ইসরার আহমাদের চিন্তার গভীরতা, নৈতিক সততা এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল আনুগত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

মূল্যবান এ গ্রন্থটি অনুবাদের প্রয়াসে আমাদের লক্ষ্য ছিল মূল উর্দু ভাষার ভাব, যুক্তি ও হৃদয়স্পর্শী গাম্ভীর্য বজায় রেখে বাংলাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া—যাতে এটি গবেষণামূলক হলেও পাঠকের জন্য সাবলীল ও প্রাণবন্ত থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, এই অনুবাদ পাঠকের টেবিলে কেবল একটি ঐতিহাসিক দলিল হাজির করবে না, বরং তাকে যুগান্তকারী চিন্তা ও আত্মসমালোচনার ধারায় প্রবেশ করাবে, যেখানে ইসলাম, রাজনীতি, নেতৃত্ব ও সমাজগঠন নিয়ে নতুন করে ভাবার আহ্বান লুকিয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই সামান্য প্রয়াস কবুল করুন, এবং এই বইয়ের পাঠের মাধ্যমে উম্মাহর চিন্তাজগত আরও পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করে দিন—এই দোয়া করি।

— সাদিক ফারহান
রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা
২১ জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হি.

কৈফিয়ত

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে, আমার ব্যক্তিগত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান *দারুল ইশাআতিল ইসলামীয়া* থেকে। বহু বছর ধরে বইটি বাজারে ছিল না। এর প্রচার ও প্রকাশ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। প্রায় সতেরো বছর পর এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে মারকাজি মাকতাবা *তানজীমে ইসলামী*। আমি শুরুতেই তাদের শুকরিয়া জানাই।

এই দীর্ঘ সতেরো বছরে সময়ের স্রোতে কত পানি যে কতখানে বয়ে গেছে! পরিস্থিতি পাল্টেছে, মানুষ বদলেছে—এমনকি কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন ধীরেধীরে অতীতের ঘন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। যারা এখনও নিজেদের নাম-পরিচয় নিয়ে টিকে আছে, তাদেরও অনেকে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে যে, চেনা মুখটি বারবার দেখেও যেন চেনা যায় না।

তবু এ বইয়ের বিষয়বস্তু এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি বিংশ শতাব্দীতে ভারত উপমহাদেশে সূচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত দ্বীনী তাহরিক তথা বৃহত ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণামূলক নীতিগত পর্যালোচনা। সেই আন্দোলন অন্তত পুরনো নামের ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলে আজও বিদ্যমান। পাকিস্তানে একটি আধা-ধর্মীয় এবং আধা-রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে, আর ভারতে একটি আধা-ধর্মীয় ও অর্ধ-সামাজিক সংগঠন হিসেবে। সুতরাং যারা এতদঞ্চলের দ্বীন ও ইতিহাস উভয়ের ব্যাপারে আগ্রহী, তাদের কাছে এই প্রশ্ন অনিবার্য হতে পারে যে, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে যে ইসলামী তাহরিক বিপ্লবাত্মক উদ্দীপনা নিয়ে সূচিত হয়েছিল, সেই আন্দোলনের কী এমন হয়ে গেল যে, এক সময়ের মজবুত সাংগঠনিক শক্তি এবং অসংখ্য নিষ্ঠাবান কর্মীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দিন দিন তা লক্ষ্য থেকে ক্রমে দূর হতে হতে আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যা দেখে আশঙ্কা হয়—অবশেষে এটি কেবলই ধর্মীয় ফেরকা বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে রূপ নেবে না তো?

তাহলে কি আমাদের ভাবতে হবে, এর সূচনাতেই কোনো ত্রুটি ছিল? যেমন কবি বলেছেন-

مری تعمیر میں مضمر تھی اک صورت خرابی کی!

"আমার গঠনেই সুপ্ত ছিল চির ধ্বংসের বিন্যাস!"

নাকি পরবর্তীকালে জীবন চলার কোনো মোড়ে এসে, আন্দোলনটি ভুল বাঁক নিয়ে ফেলেছে?

যদি প্রথমটি সাচ্চা হয়, তবে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে—প্রাথমিক চিন্তা ও তত্ত্বের ভেতরে কী ত্রুটি বা বক্রতা রয়ে গিয়েছিল। আর যদি দ্বিতীয়টি বাস্তব হয়, তবে নির্ধারণ করতে হবে, কোন পর্যায়ে এসে সেই ভুল মোড়টি নেয়া হয়েছিল।

এই প্রশ্ন আমার কাছে নিছক তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, বরং অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমি কখনো কিছু গোপন করিনি, আজও করি না। এই তাহরিক আমার হৃদয় ও চিন্তায় এক অমোচনীয় গভীর দাগ রেখে গেছে। আমি আমার যৌবনের মূল্যবান দশটি বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই আন্দোলনের কাঠামোগত ব্যস্ততায় কাটিয়েছি। কবির ভাষায় বলতে হয়—

یہ اور بات کہ تم پر نثار کر دی ہے

عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی!!

"এ সত্য অমোঘ, তোমারই নামে বিলিয়ে দিয়েছি, হে প্রিয়!
হে আমার চির যৌবনা দিনকাল, তুমি তো আর ফিরবে না!"

এমনকি সংগঠনের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর আজ প্রায় এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী কেটে গেছে, কিন্তু এখনও অবস্থাটা এমন, কবি যা বর্ণনা করে বলেছেন—

تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں ہو گئی

شرکتِ غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی!

"তুমি যে বীজ একদিন বপন করেছিলে আমার হৃদয়মাটিতে,
দুঃখের সিঞ্চনে তা আজ, অটুট প্রেমের বৃক্ষে পরিণত।"

সুতরাং আজ আমি যে কাজবাজ করছি, যে দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পথের ধারে—তা বুঝতে হলে আমার সহকর্মী, বন্ধু, সমালোচক, বিশ্লেষক কিংবা বিরোধী সবার জন্য এই আন্দোলন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি জানা এবং তা শেকড় থেকে সঠিকভাবে বোঝা জরুরি।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.) প্রদত্ত দ্বীনের প্রকৃতি ও তার দাবিসমূহের যে বিশদ ব্যাখ্যা ও রূপরেখা আমরা দেখতে পাই, তার ওপর এক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক, যুক্তিপূর্ণ ও প্রভাবশালী সমালোচনা হাজির হয়েছিল ভারতের তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী থেকে পৃথক হওয়া এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মুহতারাম ওয়াহিদ উদ্দীন খান (সম্পাদক, *আর-রিসালাহ*, দিল্লি)-এর রচিত *تعبیر کی غلطی* (তাবীর কি গালতি) গ্রন্থের মাধ্যমে। এটি বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এরও প্রায় তিন বছর আগে তুলনামূলক কোমল ও শিথিল সমালোচনার ভাষায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত *عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح* (আসরে হাজির মে দ্বীন কি তাকসীম ও তাশরীহ) বইটি প্রকাশ পায়।

একই আলোচ্য বিষয়ে আমি ইতোপূর্বে *اسلام کی نشاۃ ثانیہ: کرنے کا اصل کام* (ইসলামের পুনর্জাগরণ : মৌলিক করণীয়) নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকায় *'تعبیر کی کوتاہی'* (তাবির কি কোতাহি) অর্থাৎ 'বিশ্লেষণের ঘাটতি' শিরোনামে নিজের মত প্রকাশ করেছি।

তবে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা উচিত, বর্তমান বইটির মূল আলোচ্য বিষয় কেবল এটা নয়। এখানে মূলত *তাহরিকে জামায়াতে ইসলামী*-এর যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে—এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ১৯৪১ সালে আন্দোলনের সূচনাকালে এর মৌলিক নীতি ও প্রাথমিক লক্ষ্য কী ছিল এবং ১৯৪৭ সালে এর বৃহত্তম অংশ, অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কীভাবে এবং কেন ভুল পথে মোড় নিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি রাজনীতির জটিল গোলকধাঁধায় তা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, আজ এর প্রাথমিক সহযোগী ও অনুসারীদের বিরাট অংশ হতবুদ্ধির মতো প্রশ্ন করে—

প্রাককথন

বর্তমান গ্রন্থের মূল রচনাটি আসলে একটি প্রতিবেদন, যা আমি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে 'জায়েজা কমিটি'র সামনে পেশ করেছিলাম।

সংক্ষেপে এর পটভূমি যদি বলি—১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সুবিশাল জাতীয় সম্মেলনের সুযোগে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক অধিবেশনও আহূত হয়। সেই অধিবেশনের টেবিলে সংগঠনের নীতি ও কাঠামো-সংক্রান্ত বহু আপত্তি, বিকল্প প্রস্তাব ও পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়, যা দলের বিভিন্ন সদস্যের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল। এসব বিষয়ে আপত্তিকারী ও প্রস্তাবদাতারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার সুযোগ চেয়েছিলেন।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শূরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যদি সংবিধান ও কার্যপদ্ধতি-সংক্রান্ত জটিল ও স্পর্শকাতর এই আলোচনাগুলো সাধারণ অধিবেশনে শুরু হয়ে যায়, তবে সেখানে মতপার্থক্যগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন, দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হবে।

একটি হবে **'মজলিসে তাদউইনে দস্তর'**, যার দায়িত্ব হবে জামায়াতের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা এবং তাতে এমন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা, যারা দেশের সকল আঞ্চলিক শাখা থেকে সদস্যসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আর দ্বিতীয়টি হবে **'জায়েজা কমিটি'**, যারা জামায়াতের কর্মপদ্ধতি ও নীতি-সংক্রান্ত আপত্তি ও প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করবে। তাদের ওপর দায়িত্ব থাকবে সমগ্র পাকিস্তান ভ্রমণ করে সংগঠনের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে তাদের অস্থিরতার কারণ অনুধাবন করা এবং তাদের অন্তরের ভাবনা ও প্রস্তাবসমূহ সংকলন করে কেন্দ্রীয় শূরার সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করা।

এই 'জায়েজা কমিটি'-র জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক পরিমণ্ডল থেকে প্রতিনিধির মনোনয়ন দেওয়া হয়। **ওকারা অঞ্চলের দুই প্রতিনিধির একজন হিসেবে আমিও নির্বাচিত হয়েছিলাম।**

প্রথমদিকে এই কমিটি আট সদস্যবিশিষ্ট ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর, নানা কারণে সদস্যসংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। শেষ পর্যন্ত হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ সাহেবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার আরও তিনজন জ্যেষ্ঠ সদস্য মাওলানা আব্দুল জব্বার গাজী সাহেব, মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান সাহেব এবং জনাব শেখ সুলতান আহমদ সাহেব কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১]

তারা প্রায় আট মাসব্যাপী সমগ্র পাকিস্তান সফর করে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেন এবং অবশেষে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় শূরার সামনে পেশ করেন।[২]

---

[১] এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আমি সেই তিনজন ব্যক্তির একজন, যাদের হাতে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী সাহেব অনুপস্থিত থাকাকালীন মাঝে মাঝে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

[২] ১৫ থেকে ১৮ মার্চ ১৯৫৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা 'জায়েজা কমিটি' সংক্রান্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল—

(১) বার্ষিক সম্মেলনের সময় জামায়াতের নীতি, শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সব অভিযোগ, আপত্তি ও পরামর্শ পাওয়া গেছে, তা প্রেরণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে খতিয়ে দেখা হবে যে, এসব অভিযোগের ভিত্তি কী এবং তাঁরা সংশোধনের জন্য কী কী ইতিবাচক পরামর্শ দিতে চান।

(২) যদি জামায়াতের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ এমন থাকেন, যারা এর নীতি, কর্মপদ্ধতি বা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন চান, তাহলে তা-ও যাচাই করা হবে যে, তাঁরা আসলে কী ধরনের পরিবর্তন কামনা করেন।

এই অস্থির পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য আমি মনে করি, আমার জামায়াতের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগপত্রের নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট—

"জায়েজা কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর থেকে 'মাছি গোঠ'-এর সম্মেলন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পরিমণ্ডলে যে একের পর এক বেদনাদায়ক ও অশোভন ঘটনাপ্রবাহ চলেছে, সেগুলোর স্মরণমাত্রই মানুষের অন্তরকে যন্ত্রণায় ভরিয়ে তোলে। দীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনার পর এবং শেষ পর্যন্ত বিভেদের আশঙ্কায় একপ্রকার অনিচ্ছাকৃত ও মনঃকষ্টকর আপসের মাধ্যমে একটি অর্থহীন ও অসার প্রস্তাব পাস করা হয়। এরপর তার নানা ব্যাখ্যা, দলীয় মহলে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া, ফলস্বরূপ চক্রান্তের নতুন দিকনির্দেশ, জামায়াতের শীর্ষস্থানীয়দের পারস্পরিক নীচতা ও অপমানজনক আচরণ, সাঈদ মালিক সাহেবের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পদত্যাগ এবং একই ঢঙে কায়িমে জামায়াতের প্রতিক্রিয়া, আমিরে জামায়াতের পক্ষ থেকে কমিটির চার সদস্যের বিরুদ্ধে দলবাজি ও 'অচেতন ষড়যন্ত্র'-এর অভিযোগ, মাওলানা আমিন আহসান সাহেবের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ, আমিরে জামায়াতের আবেগঘন পদত্যাগপত্র, জামায়াতের অভ্যন্তরে আমিরের পক্ষে-বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের অভিযান, কেন্দ্রীয়

আর আমি ব্যক্তিগতভাবে জায়েজা কমিটির সামনে একটি বিবৃতি পেশ করেছিলাম, যার সংশ্লিষ্ট আলোচনা, মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ পরবর্তীতে এই গ্রন্থের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে।

প্রায় দশ বছর আগের লেখা একটি প্রবন্ধ আজ সাধারণ প্রকাশের জন্য পেশ করছি। সংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে—এতদিন কেন এটি প্রকাশ করিনি, আর এখন কেনই-বা করছি?

এর আগে প্রকাশ না করার কারণ এমন নয় যে প্রবন্ধটি কোনো জরুরি বা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত হয়নি। বরং এটি উপমহাদেশের একটি সুপরিচিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লিখিত একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হিসেবে যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক রচনাই ছিল। কিন্তু এর মূল পাঠক ছিল তাহরিকে জামায়াতে ইসলামীর সাথে যেকোনোভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গই।

তখনকার প্রেক্ষাপটে, যখন পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদন জামায়াতের অভ্যন্তরে উপস্থাপিত হয়, মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে শুধু কমিটির সদস্যরাই নয়, বরং মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী (রহ.) এবং প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন সদস্যও জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এরপর যে অভিযোগ ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের তিক্ত ধারাবাহিকতা শুরু হয়, তা জামায়াতের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে এমনভাবে কলুষিত করে তোলে যে, সেখানে ঠান্ডা মাথায় কোনো বিষয় নিয়ে নিরিবিলি ভাবার ন্যূনতম অবকাশও অবশিষ্ট থাকে না।

শূরার দুজন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত হওয়া, মাওলানা আবদুল জাব্বার গাজী সাহেবের সদস্যপদ ত্যাগ, মাওলানা আবদুল গাফফার হাসান সাহেবের সংগঠনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ, সুলতান আহমদ সাহেবের শূরা সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়ানো—এসবের কিছুই আমার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ, আমার তো শুরু থেকেই ধারণা ছিল, বর্তমানে জামায়াত আগাগোড়া রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে, যার এ ধরনের পরিণাম অনিবার্যই ছিল। কিন্তু তারপরও ঘটনাগুলো এতটা মর্মভেদী ও মনোবেদনার কারণ হয়েছিল যে, আমি জামায়াতের নৈতিক অবক্ষয় ও চরিত্রগত পতন সম্পর্কে এত নিচু ধারণা কখনো পোষণ করিনি..."

এই বেদনাভরা আত্মসমালোচনার পঙক্তিগুলো কেবল একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল নয়, বরং এক সত্যান্বেষী হৃদয়ের কান্না, যে একটি ঐতিহাসিক ও সম্ভাবনাময় আদর্শিক আন্দোলনের নৈতিক অবনতির সূচনা প্রত্যক্ষ করেছে।

এই পরিস্থিতি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রবল উত্তাপের সঙ্গেই চলতে থাকে। ফলে জামায়াতের সদস্য এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মনে এমন তীব্র দলীয় আনুগত্য জন্ম নেয় যে, তারা শুধু জামায়াত ত্যাগকারীদের কথা নয়, বরং জামায়াতের বাইরের নিরপেক্ষ কারও কথা শুনে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেও অনিচ্ছুক হয়ে ওঠে।

অবশ্য এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণভাবে জামায়াতের সাংগঠনিক সদস্যদের ওপর চাপানোও ন্যায্য হবে না। বাস্তবতা হলো, তাদের অধিকাংশের কাছেই মতবিরোধের প্রকৃত রূপ কখনো স্পষ্টভাবে পৌঁছায়নি। উপরন্তু, যারা ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন, তারা যেভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন, তা অনেকের কাছে ছিল জটিল ও দুর্বোধ্য। এর ফলে যে দলীয় পক্ষপাত ও আবেগের নরম প্রাচীর আগে থেকেই মানুষের মনে ছিল, তা ক্রমে শক্ত ও অটল এক প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে—যা যুক্তির সকল পথ ও পরিক্রমা রুদ্ধ করে দেয়।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে রচনাটি প্রকাশ করলে তাতে কোনো গঠনমূলক বা ইতিবাচক সুফল পাওয়া যাবে—এমন আশা করা কঠিন ছিল। তবে এটি প্রকাশের একমাত্র ফল যা হতো, লেখকের বুকের বোঝা কিছুটা হালকা হয়ে যেত, অন্তরে জমে থাকা ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হতো। কিন্তু অক্ষম এ বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার সীমাহীন অনুগ্রহ—যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো উপায় নেই—এই যে, এমন নিছক নেতিবাচক প্রেরণা আমাকে এর প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। গত দশ বছর ধরে আমি বহুবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এ লেখাটি পড়েছি, আর প্রতিবারই এর সত্যতা ও যথার্থতার বিষয়ে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। একাধিকবার এটি প্রকাশ করবার ইচ্ছাও জেগেছিল; কিন্তু যেহেতু তাতে কোনো ইতিবাচক ও নির্মাণধর্মী উপকারের সম্ভাবনা দেখতে পাইনি, তাই সিদ্ধান্তটি বারবার স্থগিত রেখেছি।

সাম্প্রতিক দুই-তিন বছর ধরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছে। সেই রোষ ও ক্ষোভের আগুন, যা তিক্ত অভিযোগ এবং তারও বেশি তিক্ত উত্তর-প্রতিউত্তরে দগ্ধ হয়ে উঠেছিল, অনেকটা নিভে এসেছে। মনে হয়, যারা এর পাটাতন ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা এখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত, আর যারা রয়ে গেছে তারাও নিজেদের বিষয়-আশয়ে নিমগ্ন। যদিও এখনও ইঙ্গিত ও

ভূমিকা

- সূচনা-বক্তব্য
- নিজের ব্যাপারে কিছু কথা
- সরল স্বীকারোক্তি

সূচনা-বক্তব্য

কালির হরফে লেখকের যে চিন্তা কোনো কাগুজে মলাটে জমা হয়, তা মুহূর্তেই অকস্মাত জন্ম নেয় না। অন্তত কিছুটা গভীর ভাবনা, মানসিক টানাপোড়েন, দ্বিধা ও নীরব আত্মসংলাপ পেরিয়ে সেটি এমন কাঠামোয় পৌঁছায়, যখন নির্দিষ্ট শব্দের মুখোশে তাকে পাঠকের সামনে প্রকাশ করা যায়।

এ বইয়ের পাতায় পাতায় যে চিন্তার প্রকাশ ঘটছে, তাও এমন দীর্ঘ মানসিক যাত্রার ফল। আজ আমি সাহস করে যে কথাগুলো জনতার সামনে পেশ করছি, তা নিছক আকস্মিক কোনো ঘটনার উচ্ছ্বাস নয়—বরং দীর্ঘকালের ভাবনা, অন্তর্দাহ ও আত্মসংগ্রামের নিঃশব্দ ফসল।

এসব চিন্তা যতদিন আমার মস্তিষ্কে ভার হয়ে চেপে বসেছিল, ততদিন আমি এক গভীর মানসিক সংঘাত ও আত্মিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছি। এমনটা স্বাভাবিকও বটে—যে বিষয়টির জন্য একজন মানুষ তার সম্পূর্ণ জীবন বাজি রাখে, যার জন্য সে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, সেই বিষয়ে যদি তার মন আর নিশ্চিন্ত থাকতে না পারে, তবে তার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে?

প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় আমি এমন দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় থেকেছি, যখন আমার অবসর মুহূর্তের প্রতিটি নিঃশ্বাস কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে ছিল। জীবনের অন্য কোনো জরুরি কাজ সামান্য সময়ের জন্য মনোযোগ সরালেও, এই চিন্তাগুলো আবার ফিরে এসে তনুমন গ্রাস করে নিত। নতুন কোনো জরুরি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ না করা পর্যন্ত, এরা মাথার ভেতর ঘুরত এবং আগুনের মতো জ্বলতে থাকত।

অনেকবার মনে হয়েছে, জামায়াতের কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে এই চিন্তাগুলো খুলে বলি, যাতে অন্তত মনের ভার কিছুটা হালকা হয়। কিন্তু দুটি কারণে তা সম্ভব হয়নি।

প্রথমত, নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার বোধ। মনে হয়েছে, *'ہر ایاز قدیر خود شناس'*—নিজেকে ঠিকমতো চিনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি কে এমন বিষয়ে কথা বলি? যখন সমগ্র জামায়াত—বড়ো-ছোটো সবাই—একই পথে অগ্রসর হচ্ছে, নিশ্চয়ই তাতে এমন কোনো গভীর প্রজ্ঞা নিহিত আছে, যা আমার সীমিত দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না। এতগুলো বিজ্ঞ ব্যক্তি ও জ্ঞানী মানুষ যদি কোনো পথে চলেন, তবে সেই পথ ভুল হওয়ার কথা তো নয়। হয়তো আমারই বোঝার ঘাটতি আছে কোথাও।

তবু মনে হলো, অন্তত নিজের অযোগ্যতা নিয়ে হলেও কথা তো বলা উচিত। ভুল হলেও কমপক্ষে নিজের বিভ্রান্তিটুকু পরিষ্কার হবে। একবার মনে এমন তাগিদ জাগল যে, এসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি সরাসরি মুলতান জেলে **মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)-এর** সাক্ষাৎপ্রার্থী হলাম।

কিন্তু একান্ত নির্জন পরিবেশ না পাওয়ার কারণে ও মূলত মাওলানার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই বিষয়টি খোলাসা করে বলা সম্ভব হয়নি। কেবল একটি প্রশ্নই করতে পেরেছিলাম—'মাওলানা, ১৯৪৭ সালে যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, আর কতদিন পর্যন্ত সে পথ ও পন্থা যাচাইয়ের ইচ্ছা রাখেন?'

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *'ابھی تک اس راستے کے لیے دروازے بند نہیں پا رہا ہوں'*—"এখনও পর্যন্ত আমি সেই পথের দরজা বন্ধ করতে পারিনি।"

দ্বিতীয় কারণ ছিল, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ একা মনে করতাম। ভাবতাম, পুরো জামায়াতে ইসলামীতে আমার মতের সঙ্গে মিলে এমন আর কেউ নেই। এই নাকারখানায় আমার কণ্ঠস্বর তাহলে কে-বা শুনবে! তাই নিজের অবস্থানের উপর পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসও আসত না। যদিও যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে আমার মতামত সঠিক বলেই মনে হতো, তবু বলার সাহস জোগাতে পারতাম না। মনে হতো—

'نالہ ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی،
اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی'

এই পরিবর্তন কেন?

- সম্ভাব্য কারণসমূহের বিশ্লেষণ
- মূল অনুঘটক

সম্ভাব্য কারণসমূহের বিশ্লেষণ

'জামায়াতে ইসলামী: উসকি তারীখ, মাকসাদ আওর লায়িহায়ে আমল' বইতে মাওলানা মওদুদী সাহেব এমন কিছু যুক্তি ও সম্ভাব্য কারণ একত্র করেছেন, যেগুলোর ভিত্তিতে তাঁর মতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় জামায়াতের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে তার সম্পূর্ণ আলোচনার সারমর্ম নিচের তিনটি বিষয়ে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়—

১. মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র মারাত্মকভাবে অবনমিত ছিল। তাদের মধ্যে ধৈর্য, সংযম, শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা, পরিশ্রম, সহযোগিতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, আমানতদারিতা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্বের অনুভূতি, সীমারেখা সংরক্ষণ এবং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের গুণাবলি অনুপস্থিত ছিল, যেগুলো ছাড়া কোনো জাতির সামাজিক জীবন সফল হতে পারে না। মুসলিম জাতি তখন এমনিতেই নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া অবস্থায় ছিল, এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আরও এক ভয়াবহ বাস্তবতা, তথা দশ বছর ধরে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে তাদের চিন্তাভাবনা আরও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, চরিত্র আরও দুর্বল হয়েছিল এবং তাদের সামাজিক গুণাবলি পূর্বের তুলনায় আরও অবনতি লাভ করেছিল। ভারত-বিভক্তির সময় ও তার পরপর কিছু ঘটনায় এই নাজুক এবং ভঙ্গুর পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে পড়েছিল।

এ অবস্থায়, জামায়াত নেতৃবৃন্দের ধারণা অনুযায়ী, মুসলিম জাতিকে নিজস্ব ঐতিহ্যের উপর ধরে রাখার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। তাদের মতে, এই পরিবর্তনের প্রকৃতি এতটুকুই ছিল যে, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর হঠাৎই তার পরিধি বাড়িয়ে 'কার্যকর পদক্ষেপ'-এর পর্যায়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

কিন্তু আমার মতে, এই পরিবর্তন কেবল পদ্ধতির নয়; এটি জামায়াতে ইসলামি আন্দোলনের প্রকৃতি ও চরিত্রকেই বদলে দিয়েছিল। হতে পারে,

তখন এই পরিবর্তনকে এতটা মৌলিক বলে মনে করা হয়নি; বরং নিছক এমন ধাপান্তর ভেবে নেওয়া হয়েছিল, যা একটি আন্দোলনের দুটি পর্যায়ের মাঝে সাধারণতই ঘটে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এই পরিবর্তনের গভীরতা প্রমাণ করে মাওলানার নিচের এই বক্তব্য—

"যেদিন দেশ বিভক্তির ঘোষণা হলো, আমরা বুঝে নিলাম যতটুকু ভালো বা মন্দ প্রস্তুতি আমরা এতদিন নিতে পেরেছি, এখন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে... এবং অবিলম্বে সেই জাতিকে সামলানোর চেষ্টা করতে হবে, যে জাতি হঠাৎ করেই কোনো স্পষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত কোনো নৈতিক শক্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা ছাড়াই স্বাধীন ও ক্ষমতাবান হয়ে গেছে।"

অর্থাৎ, এই নতুন পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলাম কায়েম করা' ছিল না, বরং মুসলিম জাতিকে ইসলামের আদর্শের উপর টিকিয়ে রাখাই ছিল এর মূল মাকসাদ।

২. আমাদের দৃষ্টিতে, ৪৭ সালে দেশবিভাগের রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল কৃত্রিম। ক্ষমতা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যারা গতকাল পর্যন্ত নেতা ছিলেন, আজ তারাই শাসক হয়েছেন। তারা দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিতে শুরু করলেন, আর জাতির জন্য নির্বিকারভাবে তা শুনে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকল না। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, অচেতন একটি জাতির লাগাম চলে গেছে উদাসীন এক দল শাসকের হাতে।

তখনই বোঝা গেল, এ সময় নীরব বসে থেকে কেবল তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করে যাবার সময় নয়। এক মুহূর্ত বিলম্বও ভয়াবহ বিপদের কারণ হতে পারে। যদি এখনই কিছু না করা হয়, তবে যারা কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ না করেই চলতে শুরু করেছে, তারা হঠাৎই কোনো ভুল চিন্তাকে এই রাষ্ট্রের ভিত্তি বানিয়ে ফেলবে। আর একবার তা হয়ে গেলে, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বিদ্যমান অবস্থার চেয়ে হাজারগুণ বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

৩. সৌভাগ্যক্রমে, এ সময়ে এমন কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা তৃতীয় পর্যায়ে অগ্রসর হওয়ার আগে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমাদের জামায়াত নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক দৃঢ়তার দিক